দৈনিক খবর

তারিখ ... 22 NOV 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 6 ...

চলমান আন্দোলন বনাম পরীক্ষার সমস্যা

পাহু

আমাদের দেশে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস এলে আন্দোলন তেজীভাব ধরে। সমস্ত রাজনৈতিক দল যারা সরকার-বিরোধী আন্দোলনের দীপটি ঝড়ে-বৃষ্টিতে টিম টিম করে জ্বালিয়ে রাখছিলেন, তারা নড়ে চড়ে বসলেন। এতোদিন ছিল বিবৃতি নিন্দা বাক্য মাঝে মধ্যে আধা দিবস হরতাল ইত্যাদি। এখন তিন জোটের মধ্যে যোগাযোগ বেড়েছে। বর্ষাকালে যোগাযোগ দুর্গম থাকে।

১৯৮৭ সালের উদাহরণ নিয়ে বিরোধী দল বলতে পারে যে, কথাটা সঠিক নয়। তখনও ৫৪ ঘন্টা হরতাল ডাকা হয়েছিল ঘনঘোর বর্ষায়। কিন্তু ঐ একটি উদাহরণ যথেষ্ট নয়, কারণ সে বছরই ১০ই নভেম্বর আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। প্রায় এক মাস ধরে জোর সরকার-বিরোধী আন্দোলন চলে। তারপর তা কেন ব্যর্থ হলো তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে প্রচুর। একে অন্যকে সমালোচনা করেছে। বৃহৎ বুর্জোয়া দল দু'টি সব মাটি করে দিল। তারা আপোষকামী। নিরাপোষকামীরা কেন সাধারণ মানুষকে ডাকতে পারেননি, সে কথা বলেননি।

যাদের বিরুদ্ধে আপোষকামিতার অভিযোগ, আন্দোলনে নিপুণ কূটবুদ্ধির পরিচয় না রেখে মোটা দাগে কেন তারা আন্দোলন চালাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন- এসব কথা হয়েছে প্রচুর। আবার বৃহৎ দু'টি দলের মৌলিক পার্থক্য ছিল বলে আন্দোলনের পর তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। বামপন্থীরা বলেছে, বৃহত্তর ঐক্যে একটি দল আসেনি তাই ব্যর্থতা। কিন্তু নিজেদের সংগঠন কেন টুকরো টুকরো হয়। গ্রুপ গড়ে উঠে। দীর্ঘকালের রাজনৈতিক দলগুলো কেন ব্যাপক জনসমর্থন আদায় করতে পারে না বড় দু'টি দলের মতো সেই বিচার-বিশ্লেষণ করেন না তারা। অর্থাৎ তারা একমত হননি। নিজেদের শক্তি না বাড়িয়ে অন্যের শক্তি বেশী কেন এ নিয়ে আক্ষেপ। তবে এতো বিরোধের মধ্যে বিতর্কের মধ্যে, একমত হয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ তাদের আন্দোলনে আশা-ভরসা পেয়েছে কিন্তু শরীক হয়নি। দল, লোকজন, সমর্থক আর গণসংগঠনগুলোই সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।

১৯৮৮তে ভয়াবহ বন্যার পর স্বাভাবিক কারণেই কোন বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সাধারণ মানুষের মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল না বন্যার সময়। জলবন্দী ছিল লাখ লাখ লোক। সহায় সম্বল হারিয়ে অনেকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে ব্যস্ত ছিল।

১৯৮৯তে তাই আন্দোলন দানা বাঁধেনি। ১৯৮৭'র ভাটার পর ১৯৮৮'র খরা মৌসুমে সরকারী দল তাদের ছত্রভঙ্গ অবস্থার সুযোগ নিয়েছে।

তাই ১৯৯০ সালে আবার কোমর বেঁধে লেগেছে বিরোধী দলগুলো। এই পশ্চাদ দৃষ্টি নিয়ে এবারের আন্দোলনের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে এখানে আলোচনা নয়।

১৯৮৭ সালে সরকারের পরিবর্তন আনতে পারবে বলে মধ্যবিত্ত সমাজ আশা পোষণ করেছে। গ্রামে-শহরে এই মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়ে। একটা পরিবর্তন তারাও কামনা করেছিল। তাই ১৯৮৭'র আন্দোলনে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা ও স্বার্থের কথা ভাবেনি। যেমন ভাবেনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষ।

১৯৮৮তে এসে তারা কথা বলতে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের জন্য লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে। আর এই উপলক্ষে সরকার কখনো কখনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন। ফলে অভিভাবক ও ছাত্ররা ক্ষুব্ধ হন বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী করে। এভাবে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরাও কথা বলতে শুরু করেছে। কলেজে কলেজে নির্বাচন নিয়ে হাঙ্গামা ও কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়া বা বন্ধ করে দেয়া এখন রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে দৃশ্যতঃ সরকার নেই। অর্থাৎ সরকারী দলের কোন ছাত্র সংগঠন নেই। তবে নিশ্চয়ই সরকার সমর্থক ছাত্র আছে। যারা ছিল সরকারী ছাত্র সংগঠন তারা সরকারের প্রতি সমর্থন ত্যাগ করেছে এটা সত্য নয়। ভিন্ন নামে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে কোন কোন শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করছে। সুতরাং ছাত্র আন্দোলনে সন্ত্রাস বিরোধী দলগুলো অংগ সংগঠন সৃষ্টি করে এবং জিইয়ে রাখে। আমি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠন ছাত্র দলগুলোর মধ্যে রেষারেষির কথা বলছি নির্বাচন প্রসঙ্গে। তাদের আচরণের দ্বারা বোঝা যায়, গণতন্ত্রের অনুশীলন অন্যে করুক, তারা বাহুবলের উপর নির্ভর করতে চায়। এর ফলে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চলছে। বলা হয় যে, এর পিছনে সরকারের হাত আছে। এ কথা সত্য যে, এই পরিস্থিতির সুযোগ সরকার নিচ্ছে এবং নেয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারের হাত যদি থাকে, তা সরিয়ে দেয়ার একটাই পথ- কথায় ও কাজে গণতন্ত্র অনুশীলন। আর জনসমর্থন ব্যাপকভাবে পাওয়ার পথ হলো তাদের সুবিধা-অসুবিধা ভেবে দেখা দরকার।

এখানে আমি শিক্ষার কথাটাই বলবো। তার জন্য দ্রুত পিছন দিকে চোখ বুলিয়ে নেয়া হয়েছে। কোন মতামত দেয়া হয়নি। বিভিন্ন দল ও সরকার কিভাবে চলছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো।

নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন পরীক্ষা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের সময় ছাত্র-ছাত্রীদের কথা মনে রাখে না। ছাত্র নেতারাও রাখেন না। কারণ এসব ছাত্র নেতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল ধরে আছেন। কিন্তু সাধারণ ছাত্ররা আন্দোলনের স্বার্থে এভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটাতে পারে না। হরতাল, ঘেরাও ও পথ অবরোধে এদের পরীক্ষা যথাসময়ে হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের অকৃতকার্য হওয়ার বড় কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতার এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত।

সাধারণ লোকে বিশ্বাস করে, সত্য বলে মনে করে কি-না জানি না। কোন কোন রাজনৈতিক দলের উপরতলার নেতাদের ছেলে-মেয়েদের বেশীর ভাগ বিদেশে পড়াশুনা করে, ঢাকায় করে না। যাদের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে যায়নি কিংবা যাদের অভিভাবকরা পাঠাতে পারেননি, তাদের ছেলে-মেয়েরা ক্যাডেট স্কুল বা কলেজে পড়ে। ব্যতিক্রম হয়তো আছে। সুতরাং ছাত্র ধর্মঘট, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, নির্বাচনী হাঙ্গামায় কলেজ বন্ধ- এসব তাদের স্পর্শ করে না। সুতরাং রাজনৈতিক নেতারাও কর্মসূচী দেয়ার সময় বার্ষিক পরীক্ষা ইত্যাদি কিছু বিবেচনার মধ্যে আনেন না। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক অতীতে এ নিয়ে বলেছেন। এখনও বলছেন, তবে তাদের কণ্ঠ ক্ষীণ।

বিরোধী দলগুলো তাদের আবেদন সম্পর্কে সচেতন নয়। পত্র-পত্রিকায় তারা সকলে মনোযোগ দিয়ে পড়েন কি-না জানি না। কিন্তু এদের আবেদন-নিবেদনে তেমন সাড়া দেননি। কখনো কখনো ছাত্র সংগঠনগুলো পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় বাধা সৃষ্টি করেনি এমন নজীর আছে। কিন্তু হরতাল ও ঘেরাও কর্মসূচী থাকলে সেদিন পরীক্ষা দেয়ার মতো পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে, তা কেউ নিশ্চিত নয়।

এবারও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক বিরোধী দলগুলোকে তাদের কর্মসূচী এমনভাবে নির্ধারণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন, যাতে তাদের পরীক্ষা দেয়া অসুবিধা হয়ে না দাঁড়ায়। আগামী ৮ই ডিসেম্বর থেকে ডিগ্রী পরীক্ষা। কোন কারণবশতঃ তা যদি আবার স্থগিত রাখতে হয় তবে ছাত্র-ছাত্রীরা হতাশ হয়ে পড়বে। অভিভাবকদের উদ্বেগ বাড়বে। আজকের দিনে অনির্দিষ্টকাল ধরে পড়ার খরচ যোগানোর সামর্থ্য অনেক পরিবারের নেই।

বিরোধী দলের কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন আছে এমন সব ছাত্র-ছাত্রী বিনীত আবেদন করেছেন। আমার মনে হয়, বিভিন্ন পরীক্ষার তারিখ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলো খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের আন্দোলনের কর্মসূচী নির্ধারণ করতে পারেন। অবশ্য যে কোন আন্দোলন হঠাৎ এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে যে, সেখানে সবটাই বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এজন্য তাদের কেউ অভিযুক্ত করছে না।

এ ক্ষেত্রে সরকারের দায়-দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। এই তো গত ১লা নভেম্বর ছিল এসএসসি কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা। সেদিন কার্ফ্যু ছিল। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া দেশের আর কোন শহরে কার্ফ্যু দেয়া হয়নি। ফলে কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা (ঢাকা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত) রাজধানীর ছাত্র-ছাত্রীরা দিতে পারেনি। কিন্তু তাদের কথা কেউ ভাবেননি। ওই সময় কিভাবে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে সে আলোচনা এখানে নয়। তবে সরকার যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন গোলযোগের মুহূর্তে তা কারোর অজানা নয়। তারপর সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিলেন কিন্তু এর শিকার হলো হাজার হাজার কম্পার্টমেন্টাল

তারা এখন কী করবে সে কথা সরকার এখনো ভাবছেন না। এই পরীক্ষার্থীদের জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল তার জন্য কেউ জবাবদিহি করছে না। অথচ শিক্ষা নিয়ে কত কথাই না হচ্ছে। এই হতভাগ্য পরীক্ষার্থীদের যে কোন সুযোগ দেয়া হবে না, এটা সুনিশ্চিত।

সুতরাং একতরফা বিরোধী দলগুলোর কাজকর্মের প্রতি অবিবেচনার অভিযোগ এনে লাভ নেই।

বিরোধী দল হোক আর সরকারী দল হোক- যেসব নেতার সামর্থ্য আছে তারা নিজেদের ছেলেদের বিদেশে পড়ান আর ক্যাডেট স্কুল-কলেজে পাঠান, তা নিয়ে কোন নিন্দাবাদ করা হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি নির্দিষ্ট এলিট গ্রুপ সৃষ্টি হচ্ছে যারা সরকারের দায়িত্বশীল পদের জন্যই শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত থাকবেন। এরাই রাজনীতিতে ভবিষ্যতে মুখ্য ভূমিকা নেবেন। কেউবা মন্ত্রী হবেন, কেউবা আমলা। তাই এখন আর কুটির থেকে কোন রাজনীতিবিদ উঠে আসেন না। যেমন এখন আর কোন দিন কোন গ্রামের ছাত্রকে মেধা তালিকায় দেখা যায় না। এই যে বিলুপ্তিকরণ পদ্ধতি তার ফলে সৃষ্ট অভিজাতরাই দেশের সর্বোচ্চ শাসনদণ্ড পরিচালনার সুযোগ পাবেন।

গণতন্ত্রকে ব্যাপ্ত ও কার্যকর করতে হলে সাধারণ মানুষের শিক্ষা লাভের সুযোগ এবং সুবিধা বিত্ত নির্বিশেষে সমান হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়ার সময় এসেছে।

শিক্ষাগত জীবনে তরুণদের মধ্যে এই যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে, তা-ই যুবকদের হতাশা ও বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ তারা পুরো শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না।

সুতরাং শিক্ষা সমস্যাটাও গণতন্ত্রের সমস্যা। যেখানে শিক্ষা পাওয়ার অধিকার সংকুচিত কিংবা বৈষম্যের শিকার সেখানে শিক্ষা নয়, শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। আর এর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে সমাজের অভ্যন্তরে। মূল্যবোধগুলো নিষ্পিষ্ট হয়। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ যাতে ব্যাহত না হয়, তাদের পরীক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে- এমন কোন পদক্ষেপ কোন মহল না নেয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। আর তার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর। তাদের নজর এদিকে ঘনিষ্ঠ না হওয়ায়, জনসাধারণ আন্দোলনে নেতিবাচক সমর্থন দেয়ায় বেশী অগ্রসর হয় না।